International Journal of Humanities & Social Science Studies(IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-IV, January 2018, Page No. 23-31
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বেগম রোকেয়ার জীবন ও সৃষ্টি: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

সুরজিত পাখিরা

গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

In the last half of the 19th century the Muslim Society of Bengal closed the women within four walls. Superstition, illiteracy religious conservativeness and the impact of purdah system made their life miserable. Begum Rokeya appeared at this critical time of women. In the Muslim society of Bengal Rokeya first demanded the women's similar right just like men's. She established her views against the dependency of women. Taking active participation in spreading women's education she enlightened the women race.

Uniting the Muslim women she set up an association named "Anjumane Khawateene Islam" [1916] to establish women's right.At that time it was impossible to think that breaking impediments Muslim women would take part in associations. But Rokeya's continuous attempts made it possible. For that she had to tolerate insults and threats from her own society. Depending on her own confidence she fought alone despite numerous obstacles. She wanted to say one thing through her whole life-women are also human beings, they also have the right to live in society. If the women are left behind, the development of society and nation is not possible . putting reason after reason she established her views in many writings. As a result her writings had easily taken place in literary world.

Key words: Muslim, society, women's, education, impediments.

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজ মেয়েদেরকে বদ্ধ করে রেখেছিল। কুসংস্কার অশিক্ষা ধর্মীয় গোঁড়ামি, পর্দাপ্রথার প্রভাবে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মেয়েদের এই কঠিন সংকটের সময়েই বেগম রোকেয়া আবির্ভূত হন।বাঙালি মুসলমান সমাজে রোকেয়া-ই প্রথম পুরুষের মত নারীরও সমান অধিকারের দাবি তোলেন, নারী-পরাধীনতার বিপক্ষে জোরালো মতামত প্রতিষ্ঠা করেন। নারীশিক্ষা বিস্তারে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়ে নারীসমাজকে শিক্ষার আলো দেখান।

১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে সাবের পরিবারে রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে একটা কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে। তৎকালীন মুসলিম্ সমাজে মেয়েদের পড়াশোনা নিষিদ্ধ ছিল। সাবের পরিবার বাঙালি হলেও বাংলা সেখানে অচল ছিল,উর্দু ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সমাজের বাধা এমনই কঠিন ছিল যে,পরপুরষ ছাড়াও পরনারীর সম্মুখেও পর্দা রাখতে হত।

বাল্যকাল থেকেই রোকেযার ছিল অসম্ভব জ্ঞানের পিপাসা। তাঁর দুই দাদা ইব্রাহিম ও খলিল পড়াশোনা করতেন, আর তিনি শুনে শুনে তা মুখস্থ করতেন। কোনও স্কুল বা কলেজে পড়াশোনার সুযোগ তিনি পাননি। দাদা ইব্রাহিম সাবের রোকেয়াকে বাংলা শেখান। তাঁর এই শিক্ষাও প্রকাশ্যে অসম্ভব ছিল।কিন্ত তাঁর অদম্য মানসিক জেদের কাছে সেই বাধাও দূর হয়। রোকেয়ার জীবনীকার শামসুন নাহার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-'পিতা বাংলা বা ইংরাজী শিক্ষার ঘোর বিরোধী।.....।

গভীর।। রাত্রে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় আর সেই সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে দুটি কিশোর- কিশোরীর শয়নকক্ষে স্তিমিত দীপ শিখা। চোখ মুছিয়া সেই নীরব নিশীথে দু'ভাইবোনে মোমবাতির পাশে বসেন,জ্ঞান দান করেন ভাই, আর বালিকা ভগ্নি সেই জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করেন'[১]

রোকেয়া এভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি স্বসমাজে রক্ষনশীলতার মত জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে নারীদের শিক্ষার বাধা দূর করেন। হিন্দুসমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগর য়া করেছিলেন, মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকা ও প্রায় সমান। সামাজিক কুসংস্কার নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়, এটা বুঝোই তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনেছেন, প্রায় একক চেষ্টায় তিনি নারীশিক্ষার দীপটি জ্বালিয়ে সেটাকে আলোকিত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রোকেয়া এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তাঁর স্বামী শাখাওয়াত হোসেনের জন্য। শাখাওয়াত অবরোধের বিরোধী ছিলেন। স্ত্রী রোকেয়াকে তিনি লেখাপড়ায় সাহায্য করতেন।

১৯০৯ সালের ৩রা মে স্বামী শাখাওয়াত মারা যাওয়ার পর রোকেয়া নারীশিক্ষা প্রসারে, নারীমুক্তি সংকল্পে, সমাজের কুসংস্কার দূর করতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই উদ্দেশ্যে স্বামী মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে ভাগলপুরে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে তিনি প্রথম শাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১১ সালে কলকাতায় রোকেয়া শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয় স্থাপনের শুরু থেকেই তিনি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে। রোকেয়ার জীবনে এই বিদ্যায়ালয়টিই ছিল শান্তির আশ্রয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই ছিল যেন তাঁর সন্ততির মতো। তিনি আপন ট্রাজেডি,ব্যঙ্গ- নিন্দা, কটুকথা- হুংকার এবং আরও অজস্র প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে শাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয় কে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূর করতে রোকেয়া উদ্যোগী হন, অবরোধ প্রথা সমাজ থেকে দূর হোক এটা ছিল তাঁর মনের কামনা। নারীদের মধ্যে আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাতে তিনি গুরুত্ববপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করে সমাজে তাদের আধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে একটি সমিতি ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্থাপন করেন। এই সমিতি **Calcutta Mohammedan ladies Association** নামে পরিচিত হয়।

এই সমিতির লক্ষ্য ছিল স্বাবলম্বনের মাধ্যমে নারীরা য়াতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। তৎকালীন সময়ে অবরোধের বেড়া ভেঙে মুসলিম মেয়েরা সভাসমিতিতে আংশগ্রহন করবে এটা ভাবা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু রোকেয়ার ক্রমাগত চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছিল। এর জন্য স্ব-সমাজ থেকে বহু নিন্দা- হুঙ্কার তিনি অকাতরে সহ্য করেছেন। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আপন আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে তিনি একাকী লড়াই চালিয়ে গেছেন। আজীবন একটা কথাই তিনি জোর গলায় বলতে চেয়েছেন , মহিলারাও মানুষ ,সমাজে তাদেরও বাঁচার অধিকার আছে।মহিলারা যদি পিছনের সারিতে থাকে, তাহলে সমাজ- দেশের অগ্রগতি হবে না।

মুসলমান সমাজে নারী-মুক্তি সংগ্রামের পথিকৃৎ ছিলেন রোকেয়া।তিনি অন্তঃপুর বন্দিনী নারীদের মুক্তির লক্ষে তার রচনার মধ্য দিয়ে সমাজকে নারীর দুর্বিষহ অবস্থা সম্বন্ধে জাগিয়ে তোলেন।এই উদ্দেশ্যেই তি্নি নানা প্রবন্ধ,ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর রচিত গল্প – উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু স্বল্প রচনার মধ্যেই তাঁর রচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিকতায়, বিষয়ের বৈচিত্র্যে ভাষার ঔজ্জ্বল্যে- তাঁর সমস্ত রচনাই যেন সূর্যের আলোর মত প্রতিভাত হয়েছে।মুসলিম নারীর দুঃখ-দুর্দশা-বেদনার নানা চিত্র দেখে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন-সমাজকে জাগাতে হলে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ব্যতীত উপায় নাই। যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করে তাঁর মতবাদকে নানা রচনাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।যার ফলে তাঁর রচনা সহজেই সাহিত্যজগতে আসন করে নিয়েছে।

বোকেয়ার রচনাগুলি হল- 'মতিচূর' (প্রথম খন্ড) ১৯০৫, 'মতিচূর' (দ্বিতীয় খন্ড) ১৯২১, 'পদ্মরাগ' উপন্যাস (১৯২৮), 'অবরোধবাসিনী', কিছু ছোট গল্প ও রসরচনা, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ ও কবিতা, s 'sultana' Dream" দুটি প্রবন্ধ 'GODS GIVES MAN ROBS', 'EDUCATIONAL IDEALS FOR THE MODERN INDIAN GIRL'', বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লিখত কিছুপত্র।

নারীশিক্ষা ও নারী সমিতি- এই দুই কাজের জন্য রোকেয়া অমানুষিক পরিশ্রম করতেন।ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাহিত্যসৃষ্টি: মতিচূর (প্রথম খন্ড) প্রবন্ধ সংকলনটি ১৯০৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত ' স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে ভাষা পেয়েছে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে। এই প্রবন্ধ রোকেয়া মুসলমান নারীদের জাগাতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে জানাতে চেয়েছেন সমাজে তাদের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমন করে রোকেয়ার মনে হয়েছে, কেবলমাত্র বাঙালি নারীই নয়- সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান নারীসমাজ কুসংস্কারে উপেক্ষিত ও বঞ্চিত।

নারী তার ব্যর্থতার উপর সবসময় নর্ভর করে থাকার ফলে নিজেদেরকে পুতুল ও হীন পশুর ন্যায় মনে করেছে। পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাটা নারী তার স্বভাবে পরিণত করেছে। সমাজের সবকিছুতেই যে তাদের ন্যায্য আধিকার আছে এই বোধটাই তাদের মনে জন্ম নেয়নি।

নারীকে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করার জন্য পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে নানা অলংকারে সাজিয়ে রেখেছে। প্রাবন্ধিক এই অলংকারগুলিকে অধীনস্থ থাকার প্রমাণস্বরূপ মনে করেছেন।

> *"গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন! ঐ নোলক হইতেছে "স্বামী" র অস্তিত্বের (সধবার) নীদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনী! আপনাদের এ বহুমূল্য অলংকারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে"।*[২]

নারীর সার্বিক শৃঙ্খলে রোকেয়ার অন্তরাত্মা হাহাকার করেছিল। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন- ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ হলেও সমাজে এখনও এ ব্যবসা চলছে। কারণ নারীরা ক্রীতদাসীদের মতই অবহেলিত-
অপমানিত হছে। নারীমুক্তির সার্বিক বন্ধন রোকায়ার কাম্য ছিল।

> *"বোরখা" প্রবন্ধে রোকেয়া তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে। নারীর শালীনতা বজায় থাকবে রুচিসম্মত আবরণেই- এমনটাই তিনি মনে করেছেন। পর্দার বাহুল্যের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনা করেছেন।*

ব্যক্তিগত জীবনে রোকেয়া নিজেও বোরখা ব্যবহার করতেন।সমাজ থেকে তিনি পর্দাকে দূর করতে চাননি।প্রতিবাদ করেছেন তখনই, যখন পরনারীর সম্মুখে পর্দা রাখতে হয়েছে। পর্দা সমাজ থেকে তুলে দিলে নারীসমাজের অগ্রগতি খুব বেশি ত্বরান্বিত হবে না বলে তিনি মনে করেছেন।

"সুলতানার স্বপ্ন" প্রবন্ধটি ইংরাজী **sultana's Dream** এর বাংলা অনুবাদ। বিশ শতকের অন্তিম সময়ে বাঙালি মহিলাদেরগার্হস্থ্য জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তন রোকেয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। একে কেন্দ্র করে তিনি ১৯০৮ সালে **sultana's Dream** রূপকথাটি লেখেন।

নারী অবলা, কর্মে অপটু; সুতরাং চার দেওয়ালের মধ্যে জীবন- যাপন করাটাই তাদের পক্ষে নিরাপদ- পুরুষের এই মানসিকতাকেই তীব্র কটাক্ষ করেছেন রোকেয়া "সুলতানার স্বপ্ন" রূপকথায়।

এই কল্পকাহিনীতে প্রাবন্ধিক এমন এক অপরূপ নারী- পরিচালিত জগতের কল্পনা করেছেন, যেখানে পুরুষ থাকবে অন্তপুরে বন্দী আর নারী দক্ষতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করবে।

মেরী করেলীর **Murder off Delicia** উপন্যাসের অনুবাদ করেন রোকেয়া 'ডেলিশিয়া হত্যা' নামে। ব্যক্তিগত জীবনে রোকেয়া নানা দিক থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এই গল্পটিতে তিনি দেখিয়েছেন- পুরুষ শাসিত সমাজে সভ্য দেশেও নারীর দুঃখের শেষ নাই। রোকেয়া ব্যঙ্গ করে বলেছেন-

> *"সভ্যতা ও স্বাধীনতার লালনভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত 'ডেলিশিয়া বধ কাব্য' নিত্য অভিনীত হয়! রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা"*[৩]

সহায়হীন বাঙালি বধূর সঙ্গে পতিদ্বারা নিগৃহীতা ডেলিশিয়ার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন রোকেয়া। আত্মস্বাতন্ত্র্যমুখী ডেলিশিয়া পতির খারাপ ব্যবহারের মুহূর্তে বিষধর সাপের মত গর্জে উঠেছেন।

রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল নারীজাগরন। একজন ইংরেজ নারীর সঙ্গে বাঙালী নারীর পরাধীনতার সাদৃশ্য দেখিয়ে সমাজকে তিনি জাগাতে চেয়েছেন।তাই এই উদ্দেশ্যেই তিনি ডেলিশিয়া হত্যা কাহিনীর বাংলা অনুবাদ করেছেন। বিশিষ্ট সমাজসেবিকারূপে রোকেয়া কে দেখতে পাই 'শিশুপালন' প্রবন্ধে, এই প্রবন্ধে শিশুর স্বাস্থ্য সহ শিশুর মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতিও তিনি নজর দিতে বলেছেন, কারন—

> *"শিশু রক্ষা করতে হলে আগে শিশুর মাদের রক্ষন করা দরকার"।*[৪]

রোকেয়া চেয়েছেন স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রসার ও বাল্যবিবাহ রদ। তাঁর মতে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে সুস্থ- সবল সন্তানের জন্ম তারা দিতে পারবে না। নারীমুক্তি, নারী কল্যাণের লক্ষ্যে রোকেয়া পুরুষদের কটাক্ষ্ করে বলেছেন—

> *"মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না"।*[৫]

রোকেয়ের কিছু প্রবন্ধ আছে যেগুলি তিনি জীবিত থাকাকালীন মুদ্রিত হয়নি, তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য অগ্রন্থিত প্রবন্ধ গুলি হল- "সিসেমফাঁক", "ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম", "বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি", "নারীর অধিকার" প্রভৃতি।

'সওগাত' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে "সিসেমফাঁক" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রোকেয়া নারীশিক্ষায় গাফিলতির ব্যাপারে ইসলাম সম্পাদায়কে কটাক্ষ করেছেন। কাসেম গুপ্ত ধনাগার থেকে ধনসম্পদ হস্তগত করে বাইরে বের হতে পারেনি। বের হওয়ার মন্ত্র "সিসেমফাঁক" সে ভুলে গিয়েছিল। যার ফলে সে বিপদের সম্মুখীন হয়। ঠিক একই রকম ভাবে বাংলার ইসলাম সম্প্রাদায় আপন স্বাধীনতার জন্য নারীশিক্ষার প্রসারকে পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিল। জাতির অগ্রগতির পিছনে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যার ঘাটতি মুসলমান সম্প্রদাযের মধ্যে দেখা যায়।

অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এই সম্প্রদায়ের চেতনার জাগরণ হয়েছে। নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমান পুরুষেরা আগ্রহ দেখিয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন—

> *"এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছেন স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই।.....। চতুর্দ্দিকে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।"*[৬]

সরসতার সঙ্গে তীক্ষ্ণতার সমন্বয়ে প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট হয়েছে।

'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' প্রবন্ধটি 'মোহাম্মদী' প্রত্রিকায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রোকেয়া মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কামনা করেছেন। যেখানে তারা আদর্শ সুকন্যা, সুগৃহিনী ও সুমাতা হওয়ার জন্য তৈরী হতে পারে।

সেই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মুসলমান মহিলাদের অগ্রগতি রোকেয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। শিক্ষা না পাওয়ার জন্যই তাঁর স্বসমাজের মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, কাউন্সিলার, গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য হওয়া থেকে বঞ্চিত হছে। তিনি আশা করেছেন—

> *"আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মোসলেম নারী গঠিতা হবে,- যাদের সন্তান- সন্ততি হবে হজরত ওমর ফারুক, হজরত ফতেমা জোহারার মত"*[৭]

সেই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, যে ধ্যান ধারনা ব্যক্ত করেছেন, সেজন্য তাঁকে নিঃসন্দেহে বঙ্গের রেনেসাঁসের উত্তরাধিকারী বলা যায়।

Bengal women's Education conference এর এক সভাতে রোকেয়া সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করে "বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি" নামে একটি বক্তব্য রাখেন।সেই বক্তব্যের লিখিত রূপটিই হল 'বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি' নামক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষার খারাপ অবস্থা সম্বন্ধে রোকেয়া জানিয়েছেন-গড়ে দুইশত বালিকার মধ্যে একজনেরও অক্ষর পরিচয় জ্ঞান নাই।সুশিক্ষিতা মহিলা দশহাজারের মধ্যে বোধহয় একজনও নাই।কিন্তু বঙ্গদেশে প্রায় তিনকোটি মুসলমান বসবাস করে।তিনকোটি ইসলাম মহিলাদের মধ্যে গ্রাজুয়েট শুধু একজন। কিন্তু পয়গম্বর সাহেবের নির্দেশে নারীশিক্ষা লাভ অবশ্য কর্তব্য।মুসলমান মহিলাদের শিক্ষার এই খারাপ অবস্থাকে রোকেয়া মেনে নিতে পারেননি। স্বসমাজের পুরুষদের কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন—

> *"যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না,তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্দ্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্খা পাগলেরই শোভা পায়"*[৮]।

পুরুষের বহুবিবাহ, তালাকপ্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন রোকেয়া "নারীর অধিকার" প্রবন্ধে।বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতির দাবি জানিয়েছেন তিনি।রোকেয়া লক্ষ্য করেছেন তালাক দেওয়া হয় শুধুমাত্র পুরুষের ইচ্ছাতেই। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সেখানে কোন মূল্যই নেই। এই একতরফা বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তালাক দেওয়ার সময় পুরুষটি তিনবার জোরে জোরে বলে—

> *"আয়েন তালাক বায়েন তালাক,*
> *তালাক তালাক, তিন তালাক*
> *আজ জরুরে দিলাম তালাক"*[৯]

মেয়েটির সেই সময় দুঃখের শেষ থাকেনা।

বাল্য বিবাহের কুফল রোকেয়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাল্য বিবাহকে সমাজ থেকে দূর করতে তিনি উদ্যোগী হন। বয়স্ক পুরুষের বালিকা-বিবাহের সাধকে তিনি শ্লেষের সঙ্গে একটি ছড়ায় উদ্ধৃত করেছেন। ছড়াটি হল—

"হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
হুকুর হুকুর কাশে
নিকার নামে হাসে বুড়া
ফুকুর ফুকুর হাসে।"[১০]

অমুদ্রিত এই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায় ইসলাম ধর্মসম্বন্ধে রোকেয়ার ধারনা কিরূপ ছিল।মৌলবীদের তিনি ভয় পাননি। তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে স্বসমাজের চেতনা জাগাতে চেয়েছেন তিনি। তিনি মুসলমান মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার

উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়কে আদর্শ মুসলিম বিদ্যালয়ের রূপ দিতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল যেভাবেই হোক, মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতেই হবে।

'পদ্মরাগ' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী অত্যাচার- নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এই উপন্যাসের রাফিয়া, সাকিনা, হেলেন, ঊষা, কোরেশা- প্রমুখ নারীচরিত্র গুলি সাংসারিক জীবনে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে তারিনী ভবনে। এই ভবনের সমাজসেবামূলক নানা রকম ক্রিয়াকর্মে তারা আত্মনিয়োগ করে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে চেয়েছে, অতীতকে ভুলতে চেয়েছে। তারা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থেকে এলেও তাদের ভাগ্যের লিখন একই, তারা সবাই নির্যাতিতা হয়েছে।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসে 'তারিনীভবন' হল একটি প্রতিষ্ঠান। অনাথ নিপীড়িতা নারীরা স্বাবলম্বী হয় এখানে। সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি কলকাতায় হলেও এর বিস্তার কলকাতা ছাড়িয়ে মুঙ্গের, রাঁচী, উত্তরবঙ্গ, কাশিয়াং এমনকি ইংল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখানেই রোকেয়া কালজয়ী সাহিত্যিকের পরিচয় রেখেছেন।

উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা নিপীড়ত হয়েছিল পুরষের দ্বারা, কিন্ত তার আত্মমর্যাদাবোধ, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রবল ইচ্ছার জন্য সে অপমান মুখ বুজে সহ্য করেনি। প্রবল আত্মসম্মান বোধের জন্যই সে সংসারের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে আসে। লতীফের ডাকে সাড়া না দিয়ে সিদ্দিকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে দেখাতে চেয়েছে-নারী ফেলনা নয়, তারও আত্মমর্যাদাবোধ আছে।

উপন্যাসটি পাঠ করে বোধগম্য হয়- ঔপন্যাসিকের ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে, ধারণা আছে, কিন্ত হৃদয়ে কোনো ভেদ নেই। হিন্দু-মুসলিমের পাশাপাশি অবস্থানের এক সুন্দর ছবি পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব প্রতিবাদ জানিয়েছেন রোকেয়া এই উপন্যাসে। নানা সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন-কোন সম্প্রদায়ই নারী নির্যাতনে কম যায় না।

তীব্র সমালোচনা ব্যঙ্গ সহ্য করেও রোকেয়া ওরফে দীনতারিনী উপলব্ধি করেছেন-মহিলারা ঐক্যবদ্ধ্ হলে তুচ্ছ বাধা কাটিয়েও সমাজসেবা করা যায় "পদ্মরাগ' উপন্যাসে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

জাতি- ধর্ম- সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে এমনই একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই রোকেয়া আশা করেছিলেন।

রোকেয়া 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে কিছু প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ করেছেন,-
প্রশ্নগুলি হল-

"সমাজের এইসব নালীঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধা থাকিতে হইবে, বিনা কারনে পরিত্যক্তা হইতে হইবে। অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই"।

অসীম সাহসিকতার সঙ্গে অনন্ত তেজের সঞ্চার করেছেন রোকেয়া 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নারীচরিত্র গুলিতে, জয়নব ওরফে সিদ্দিকা সমাজকে দেখাতে চেয়েছে-সংসারধর্ম পালনই নারীজীবনের একমাত্র কামনা নয়। সেই সময়ের ঘুমন্ত নারীদেরকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন রোকেয়া সিদ্দিকার মধ্য দিয়ে। অসহায় নারীকে নতুন করে জীবন দিতে, তার আত্মমর্যাদাবোধ ফিরিয়ে আনতে রোকেয়ার স্বপ্ন সফল হয়েছে 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে।

একুশ শতকেও মিডিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা নারী-নিগ্রহের ঘটনা নিয়মিত দেখতে পেলেও বেশিদিন মনে রাখি না। সেজন্যই 'পদ্মরাগ' উপন্যাস কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

'অবরোধবাসিনী' ১৯৩১ নকশাজাতীয় গ্রন্থ। এতে সাতচল্লিশটি কাহিনী আছে। এটি মোহাম্মদী প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গাজী মিয়া প্রমুখ সাহিত্যিকরা সমাজকে ব্যঙ্গ করে যে নকশাজাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন,রোকেয়ার 'অবরোধবাসিনী' সেই জাতীয় গ্রন্থ। কিন্তু উপস্থাপনা বা বক্তব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ,কালীপ্রসন্ন বা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রোকেয়ার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

'নকশা বা সমাজচিত্র হিসাবে এগুলি অভিনব- কেননা আলাল, হুতোম্, গাজীমিয়া বা কমলাকান্ত কেউই এই জগৎটিকে দেখেননি এবং দেখাননি, একজন সৃষ্টিশীল সচেতন নারী-লেখিকা ছাড়া এরকম দরদী নির্মমতায় এই জীবন চিত্র উদ্ঘাটন করা সম্ভব ছিল না' (বেগম রোকেয়া)।

পর্দাপ্রথার কুফল 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, পর্দার বেড়াজলে নারীর চরম দুর্দশার চিত্র এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।

এই গ্রন্থে পর্দাপ্রথার পরিণতি ও এর কৌতুকময় ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে এ সম্বন্ধে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন, পাঠ করেছেন বা শুনেছেন তার উজ্জল চিত্র এখানে পাওয়া যায়, শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, পাঞ্জাবের কিছু জায়গাও গল্পগুলির ঘটনাস্থল, এই গ্রন্থে শুধুমাত্র মুসলিম সমাজ প্রচলিত পর্দার ছবিই তিনি তুলে ধরেননি, হিন্দু মহিলারাও যে পর্দাপ্রথার কুফল ভোগ করত তারও চিত্র পাওয়া যায়।

'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের ৩নং রচনাটিতে রোকেয়া দেখিয়েছেন-কখনও নারী পর্দার জন্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে, স্টেশনে হজযাত্রী মুসলমান মহিলাদের বোরখার আবরণ থাকা সত্তেও পর্দারক্ষার জন্য জোরপূর্বক তাদের উপর শতরঞ্জি চাপিয়ে দেওয়া হয়। জনৈক রেল কর্মচারী আন্দাজ করেছিল সেগুলি মালবোঝাই বস্তা।

কর্মচারী একটি বস্তায় (মহিলাকে) জুতোর গুঁতো মেরে বস্তাগুলির(মহিলাদের) মালিককে (মহিলাদের) প্লাটর্ফম থেকে সরাতে আদেশ করে। বেচারী "বিবিরা পর্দার অনুরোধে জুতার গুতা খাইয়াও টু শব্দটি করেন নাই"।

৮ নং কাহিনীতে মুসলিম মহিলাদের পর্দা প্রথার সম্মান রক্ষার এক মর্মস্পশী বিবরণ পাওয়া যায়। বাড়িতে আগুন লাগার পর গৃহিনী সমস্ত অলংকার একটা বাক্সে ভরে বাড়ীর বার হতে চাইলেন। পুরুষরা সেই সময় আগুন নেভাচ্ছিল, ইজ্জত রক্ষার জন্য তিনি বাড়ির ভিতর খাটের নীচে বসলেন। সেখানে তিনি পুড়ে মারা গেলেন। কিন্ত পুরুষের সামনে বের হলেন না, রোকেয়া আক্ষেপ করে বলেছেন- "ধন্য কুলকামিনীর অবরোধ!"

১১ নং কাহিনীতে পর্দার কঠিন ঘেরাটোপে নারীর গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার বিবরণ দিয়েছেন রোকেয়া। বিহারে বিবাহের ৬/৭ মাস আগে থেকে মেয়েদের বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়। এমনকি

জানালা পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এইভাবে কয়েকমাস অবরোধে থেকে মেয়েরা শারীরিক অসুস্থতার শিকার হয়। এই কাহিনীর মেয়েটি (সবু) অবরোধে থেকে হিস্টিরিয়া'র শিকার হয়েছিল।

৩৯ নং কাহিনীতে মুসলমান সমাজের কুসংস্কারের একটি নিষ্ঠুর পরিণাম পাওয়া যায়। কোন একসময় হজরত আয়শা সিদ্দিকা নাম্নী একটি মেয়ে মাত্র নয় বছর বয়সেই বয়োঃপ্রাপ্তা হয়েছিল। সেজন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাড়িতে মেয়েদের বয়স আট বছর পার হলেই তাদেরকে রক্ষনশীল তার শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলা হয়।এইরকম এক পরিবারের আট বছরের একটি মেয়ে (তাহেরা) রান্নাঘরের চালে ঠেকান মইয়ে দু'ধাপ উঠেছিল। তা দেখে তার পিতা জ্ঞানশূন্য হয়ে টেনে- হিঁচড়ে মই থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনার পরে মেয়েটির প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল।ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তাহেরা মারা গিয়েছিল। রোকেয়া একটি তির্যক বাক্যে এখানে সামাজিক কুসংস্কারের সমালোচনা করেছেন—

"পিতার রূঢ় ব্যবহারের নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর দিয়া তাহেরা চিরমুক্তি লাভ করিল"[১৪]

মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে রোকেয়া যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেছিলেন, সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়ীর পর্দা সম্বন্ধে রোকেয়াকে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। ৪৭ নং কাহিনীতে সেই সমালোচনা ও তাঁর মানসিকতা সম্বন্ধে জানা যায়। গাড়ীর পর্দা এতই নিখুঁতভাবে তৈরী যে সেটাকে নিঃসন্দেহে 'এয়ার টাইট' বলা যায়। গাড়ীতে বাতাস প্রবেশ করতে না পারার জন্য যাতায়াতের সময় ছাত্রীরা ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। কিছু ছাত্রীর অভিভাবিকা গাড়ীর পর্দা সম্বন্ধে রোকেয়ার সমলোচনা করেন-
"আপকা মোটর ত খোদা কা পানাহ! আপ লাড়কীয়োঁ কো জীতে জী কবর মে ভর রহি হয়ঁ"।[১৫]

অভিভাবিকারা আরও জানিয়েছিলেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি পর্দার ভালো ব্যবস্থা না করেন, তবে অভিভাবিকারা বিদ্যালয়ের নিন্দা করবেন।

কাহিনীর শেষে রোকেয়া জীবন্ত বিষধর সর্পের উপমা দিয়ে সেই সময়েরর মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন- এতো ভারী বিপদ,-

"না ধরিলে রাজা বধে,- ধরিলে ভুজঙ্গ"

'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে রোকেয়া দেখিয়েছেন- প্রকৃতই মুসলমান নারীদের উপর এক অন্যায় বিধি জোরপূর্বক চাপানো হয়েছে। তৎকালীন ঘটনাগুলি পড়ে বর্তমান পাঠকরা যত মজাই পাক না কেন, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে পর্দাঘেরা মহিলারদের অসহায় অবস্থা পাঠকের মনকে নাড়া দেয়।

রোকেয়ার কিছু ছোটগল্প ও রস- রচনা, আছে যেগুলি বিভিন্ন সময়ে 'নবনূর', 'ভারত মহিলা', 'বঙ্গীয় মসুলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'সওগাত, 'নওরোজ','মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প ও রস-রচনাগুলি হল- 'ভ্রাতা-ভগ্নী', 'প্রেম-রহস্য, 'তিন কুঁড়ে','পরীটিবি, 'বলিগর্ত', 'পঁয়ত্রিশ মণখানা', 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি। এই রচনাগুলি শুধুমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্যই তিনি লেখেননি, সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল।

প্রবন্ধটির আয়তন বৃদ্ধির জন্য এগুলিকে আলোচনায় রাখতে পারলাম না।

রোকেয়ার কিছু অগ্রন্থিত কবিতার আছে, যেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে রোকেয়ার বৈধব্য যন্ত্রণা, স্বদেশপ্রেম, নিসর্গপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবন্ধটির আয়তন বর্ধিত হওয়ার কারনে কবিতাগুলিকে আলোচনার মধ্য রাখতে পারলাম না।

রোকেয়ার লিখিত চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি রোকেয়াকে ভালোভাবে জানা যায়। চিঠিগুলির বেশিরভাগই কুটুম্বজন বা পরিচিতিদেরকে লেখা। কিছু চিঠিপত্র পত্রিকার শিরোনামের জন্য লিখিত।

পত্রগুলিতে রোকেয়া আপন যন্ত্রণা- হতাশা-কটুম্বজনের দ্বারা নানাভাবে উপেক্ষা-বঞ্চনার কথা জানিয়েছেন। ছাত্রীনিবাস চালু করতে গিয়ে তিনি যে বাধার সম্মুখীন হন তাও পত্রগুলিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ যে কত কঠিন, ছাত্রীদের অভিভাবকরা যে তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেননি- এ সম্বন্ধে ও চিঠিপত্রে তিনি জানিয়েছেন।

প্রবন্ধটির কলেবর বৃদ্ধির কারনে চিঠিপত্রগুলির আলোচনা করতে পারলাম না।

'**Sultana's Dream**' (১৯০৮) রচনাটি ইংরাজীতে লেখা।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে রোকেয়া ইংরাজীতে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ দুটি হল- '**GOD GIVES, MAN ROBS**' ও '**EDUCATIONAL IDEALS FOR THE MODERN INDIAN GIRL**'

উপসংহার: আজও রোকেয়ার লেখায় পাঠকরা আকৃষ্ট হয় কেন? এ সম্বন্ধে বলা যায় সমাজে নারীর এখনও বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি, রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল- যে কোন প্রকারেই হোক মুসলমান নারীদের ঘুম থেকে জাগাতে হবে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এখনও মুসলমান নারীরা আগের অবস্থাতেই আছে। তাই রোকেয়ার লেখা আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। মুসলমান নারীর জাগরণ রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনা হলেও সেই সময়ের নারীবাদের মধ্যেই তাঁর ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল না। অনেক বিবেচনা করে তিনি সমাজকে কাটাছেঁড়া করেছেন। শুধু মুসলমানদের নয়, হিন্দুদেরও তিনি বলেছেন-নারীকে শিক্ষার আলো দেখাতেই হবে। বস্তুতঃ বাঙালির ত্রুটিগুলিকে তিনি যুক্তিসহ বিচার করেছেন।

ভারতবর্ষের মতো বড় দেশে যেখানে ধর্ম নিয়ে ভারতবাসীদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়; সেখানে অনায়াসে জীবন ও ধর্মকে একই সুতোয় বেঁধে বেগম রোকেয়া মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

সূত্র নির্দেশ :

১. অনিল ঘোষ সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী, ঙ, কথা সংস্করণ ২০১৪।
২. বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের অগ্রদূত-আনোয়ার হোসেন, পৃষ্ঠা ৬৯, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ২০০৬।
৩. অনিল ঘোষ সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী পৃষ্ঠা-১২৫, কথাসংস্করন ২০১৪।
৪. ঐ পৃষ্ঠা ১৭৪, কথাসংস্করন ২০১৪।
৫. ঐ পৃষ্ঠা ১৭৪, কথাসংস্করন ২০১৪।
৬. ঐ পৃষ্ঠা ২২৯, কথাসংস্করন ২০১৪।
৭. ঐ পৃষ্ঠা ২৬৮, কথাসংস্করন ২০১৪।
৮. ঐ পৃষ্ঠা ২৪৫, কথাসংস্করন ২০১৪।
৯. ঐ পৃষ্ঠা ২৭৬, কথাসংস্করন ২০১৪।
১০. ঐ পৃষ্ঠা ২৭৬, কথাসংস্করন ২০১৪।
১১. ঐ পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৩৮, কথাসংস্করন ২০১৪।
১২. রোকেয়া পাঠ ও মূল্যায়ন-মোরশেদ শফিউল হাসান,পৃষ্ঠা ৭৮, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৫।
১৩. ঐ পৃষ্ঠা ৭৯।
১৪. অনিল ঘোষ সম্পাদিত রোকেয়া রচনাবলী পৃষ্ঠা ৪৩২, কথাসংস্করন ২০১৪।
১৫. ঐ পৃষ্ঠা ৪৩৮, কথাসংস্করন ২০১৪।